গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন

বিষয়

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের পর্যালোচনা ও আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫, কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

০৯ জানুয়ারী ২০১৩

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের পর্যালোচনা ও আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ

০৯ জানুয়ারী ২০১৩

পটভূমি

মুসলিম পারিবারিক আইনের মূল উৎস পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্। কোন প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পবিত্র কোরআন বা সুন্নাহ্য় না পাওয়া গেলে তার মীমাংসার জন্য মহানবী (সাঃ) এর সঙ্গী ও শিষ্যদের মধ্যে ঐকমত্য (ইজমা), এবং এই তিনটি উৎসের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনায় সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্তের (কিয়াস) সহায়তায় সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। এর পরেও অনেক অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান বা সন্দেহ দূরীকরণ কিংবা স্পষ্টতা আনয়নের জন্য যুগ যুগ ধরে ইস্তিহ্সান, ইস্তিসল্াহ এবং ইস্তিহাদ বা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যর মাধ্যমে এই আইনকে সমৃদ্ধ করা হয়।

বিগত প্রায় একশত বৎসরে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন, যার মধ্যে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অন্যতম, ও উচ্চ আদালতের রায়ের মাধ্যমে পারিবারিক আইনকে অধিকতর সমৃদ্ধ করা হয়েছে। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে উল্লিখিত সমৃদ্ধি যেন প্রাথমিক উৎস পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক হয়; কোন ক্রমেই যেন তা প্রাথমিক উৎসের লঙ্ঘন না হয় এবং যে কোন সিদ্ধান্ত হয় কোরআন-সুন্নাহর যৌক্তিক ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যাপ্রসূত।

মনে রাখা বাঞ্ছনীয় বাংলাদেশে মুসলিম আইন যা শরীয়াহ্ নামে পরিচিত শুধু পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যান্য অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে শরীয়াহ্ দেওয়ানী, সাক্ষ্য এবং এমনকি ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের দেশে ১৯৩৭ সনের শরীয়াহ্ সংক্রান্ত আইন দ্বারা এর প্রয়োগ পারিবারিক ক্ষেত্রে সীমিত রাখা হয়েছে।

আরো স্বর্তব্য, আমরা যদি শরীয়াহ্ বলতে শুধু পারিবারিক আইনই বুঝি, সে শরীয়াহ্র অবয়ব ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত মুসলিম আইনের বিভিন্ন ধারা, উপ-ধারায় যেমন, সুন্নি, শিয়া, ইসমাইলী, আহমেদিয়া, বা বিভিন্ন মুসলিম প্রধান বা মুসলিম রাষ্ট্রে এক রকম নয়, যদিও তার মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্।

ইস্তিহাদের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে যে মুসলিম আইনের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে তার দরজা কিন্তু কখনোই বন্ধ হয়নি, বরং তা প্রসারিত হয়েছে নব নব প্রেক্ষিত তৈরীর কারণে। মানব মঙ্গলের জন্য কোরআন ও সুন্নাহ্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নের মীমাংসা কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক ব্যাখ্যায় নিস্পত্তি করা কোরআন অনুমোদনই করে। মহানবী ও খলিফাদের অনেক কথা বা আচরণে এর প্রমাণ মেলে। কোরআন ও সুন্নাহ্ সরাসরি নিষিদ্ধ করেনি এমন বিষয়ের যুক্তি নির্ভর আইন প্রণয়ন করা যায়, বা বিচারক সেভাবে রায় দিতে পারেন।

প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনে সাম্য ও বৈষম্য

উল্লেখ্য, প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন বা শরীয়াহ্ যে রূপে বাংলাদেশে চালু রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। এই বৈষম্য পবিত্র কোরআন ও হাদিসের মর্মবাণীর পরিপন্থী। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলাম প্রবর্তনের সময় নারী অধিকারের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ্ ছিল সবচেয়ে নারী অধিকার বান্ধব। শুধু প্রাক-ইসলামী আরব দেশই নয়, বিশ্বের যে কোন স্থান বা ধর্মের সঙ্গেঁ তুলনায় তা ছিল অধিকতর প্রগতিশীল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সমগ্র জীবন, কর্ম, আচরণ ও উপদেশ তার প্রমাণ বহন করে।

কোরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক সেই শরীয়াহ্কে যখন নারী অধিকার বিরোধী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত করা হয়, তখন তার সমাধান কোরআন ও সুন্নাহ্র সঠিক ব্যাখ্যায়ই খুঁজতে হবে। কোরআন ও সুন্নাহ্য় বার বার নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আক্ষরিক ব্যাখ্যা বৈষম্যমূলক মনে হলেও তা যৌক্তিক

ব্যাখ্যায় নিষ্পন্ন করা যায়। অনেক সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য কোন বিধান করা হয়েছে যা আপাত বৈষম্যমূলক মনে হলেও চূড়ান্ত বিবেচনায় তা মনে হবে না। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনই সবচেয়ে বেশী সমালোচিত। নোবেল জয়ী ইরানী মানবাধিকার নেত্রী ও লেখিকা শিরিন এবাদীর মতে "কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা এমনকি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও নারীদের সমানাধিকার দেবে"।

মনে রাখতে হবে পারিবারিক আইনের বিষয়টি নারীর মানবাধিকারের বিষয়, কারণ প্রত্যেক ধর্মে প্রচলিত পারিবারিক আইন নারীর প্রতি কম-বেশী বৈষম্যমূলক। এতে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। এই বৈষম্য যতটা না আইনের মূল উৎসের কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশী উৎসসমূহের আক্ষরিক, প্রেক্ষাপটহীন ও স্বার্থবাদী ব্যাখ্যার কারণে। বাংলাদেশে শরীয়াহ্ আইন নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে যার নিরসন হওয়া অপরিহার্য।

আমাদের বিশ্বাস বাংলাদেশে প্রচলিত ও অলিখিত আইনের পাশাপাশি যে সকল প্রণীত আইন রয়েছে এবং উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর রয়েছে তা পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্র প্রগতিশীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে করা হয়েছে। কোরআন ও সুন্নাহ্র আরো অনেক বিধানের যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারী-পুরুষের অধিকারগত ব্যবধান আরো হ্রাস করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ করার জন্যই বর্তমান গবেষণা নিবেদিত।

আইন কমিশনের নিজস্ব এই গবেষণায় UNDP এর অর্থায়নে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পরিচালিত "Promoting Access to Justice and Human Rights in Bangladesh" প্রজেক্ট থেকে সহায়তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আইন কমিশন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। এছাড়া যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ প্রশ্নমালা পূরণ বা অন্যভাবে আমাদের গবেষণা প্রয়াসকে সহায়তা দান করেছেন তাদেরকে আইন কমিশন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণার অন্যমত প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অভিভাবকত্ব, হেফাজত, ভরণপোষণ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ আদালতের রায়সমূহের পর্যালোচনা ও তার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা। এতে আইনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও সুনির্দিষ্টতা আসবে। প্রণীত আইন সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা এবং তার প্রয়োগ সহজতর করবে।

এছাড়া কিছু প্রচলিত বিধানের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্র্যাকটিসের আলোকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, যেমন বহুবিবাহ্, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্র আক্ষরিক নয়, ভাবগত, পরিপ্রেক্ষিত, উদ্দেশ্যগত ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এছাড়া রাষ্ট্রের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধানাবলীও স্মরণ রাখা অপরিহার্য।

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ্ সংবিধান, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গেঁ, বিশেষ করে বাংলাদেশ যে সকল আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির পক্ষ, সাংঘর্ষিক নয়, হতে পারে না এটা মনে রেখে, বা সাংঘর্ষিক হলে তা নিরসণ করেই আইন প্রণয়ন করতে হবে। সাংঘর্ষিক অবস্থা কোনক্রমেই কাঙ্খিত হতে পারে না এবং চলতে পারে না। গবেষণায় এই সংঘর্ষের সমস্যাও সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার জন্য প্রাথমিক এবং দ্বিতীয়, দু-পর্যায়েই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য, তথ্যের উৎস, বিষয়ভিত্তিক প্রচলিত আইনগুলো যাচাই-বাছাই, বিশেষজ্ঞ মতামত, উচ্চ আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্ত, অন্যান্য মুসলিম দেশের পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা এ রকম অনেক বিষয়ে এতে প্রায়োগিক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মুসলিম ও হিন্দু পারিবারিক আইন নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করেছে, এ ধরনের কয়েকটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের গবেষণালব্ধ তথ্য ও প্রাপ্ত ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হয়। এসব তথ্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে গবেষণার জন্য কয়েকটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়।

এরপর মাঠ-পর্যায়ে প্রশ্নমালা বিতরণের মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইনের বিষয়ভিত্তিক জনমত, উত্তর ও পরামর্শ সংগ্রহ করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির কাছ থেকেই যেন বাস্তব তথ্য পাওয়া যায় এবং পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত জটিলতাগুলো শনাক্ত করা যায়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে একটি আলোচনাপত্র তৈরি করা হয় যার ওপর ভিত্তি করে ৩টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয় রাজশাহী বিভাগে। পারিবারিক আইন নিয়ে কাজ করছেন এবং অভিজ্ঞ এমন ব্যক্তিদের নিয়েই ফোকাস গ্রুপে আলোচনা করা এবং তাদের মতামত নেওয়া হয়; একই সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত প্রতিফলিত হয় কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। এ ছাড়া পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরীয়াহ্ আইনের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইনকে আরও সুসংহত করার উপায় নিয়ে ফোকাস গ্রুপে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ বিভিন্ন মামলায় মুসলিম পারিবারিক আইনের নানা দিকের উপর আলোকপাত করেছেন। কোরআন-হাদিসের আলোকে যুক্তিনির্ভর রায়ও দিয়েছেন। সেসব রায় পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং রায়ের পেছনের যুক্তিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশও পারিবারিক আইনের সংস্কারের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। তাদের সেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষাপট, যুক্তি ও পদ্ধতিগুলোও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক যেসব প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পারিবারিক বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে, সেগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এসব আইন নিরীক্ষা করে দেখা হয়, খোঁজা হয় শূন্যস্থান কী আছে। এ সংক্রান্ত আইনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এমন বইগুলোও পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখযোগ্য আইনগুলো হলো–

- The Family Courts Ordinance, 1985
- The Muslim Family Laws Ordinance, 1961
- The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974
- The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939
- The Child Marriage Restraint Act, 1929
- The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937
- The Guardians and Wards Act, 1890
- The Code of Civil Procedure, 1908
- The Court of Wards Act, 1879

বহুবিবাহ

মুসলিম পারিবারিক আইনে অন্যতম বিতর্কিত বিষয় হলো বহুবিবাহ। নানাজন নানাভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় ইসলাম পূর্ব আরবে বহুবিবাহর প্রচলন ছিল। গোত্রীয় সংঘাতের কারণে বহু নারী বিধবা বা এতিম হয়ে পড়াই এর মুখ্য কারণ। মূলত তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্যই ইসলাম বহুবিবাহ অনুমোদন করে। তবে ইসলাম বহুবিবাহের সংখ্যাকে সীমিত করে দিয়েছে এবং স্ত্রীদের প্রতি আচরণ কেমন হবে সেটা ঠিক করে দেওয়ার মাধ্যমে বহুবিবাহ বিষয়ে ইসলামের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে (Dr. Rabia Bhuiyan, Gender & Tradition in Marriage & Divorce, An analysis of Personal Laws of Muslim and Hindu Women in Bangladesh, Published by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; p.93).

ইসলাম বহুবিবাহের এই প্রচলিত ব্যবস্থা সীমিত করে এর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয় ৪-এ। এ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতের নানা ব্যাখ্যার কারণে বিভিন্ন রকম মতবাদের উদ্ভব হয়। ফলে সৃষ্টি হয় জটিলতার। পবিত্র কোরআনে বলা আছে (সুরা নিসা, আয়াত-৪)ঃ

> **"আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে পিতৃহীনদের ওপর সুবিচার করতে পারবে না তবে বিয়ে করবে (স্বাধীন) নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন বা চার জনকে। আর যদি আশঙ্কা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে বা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এভাবেই তোমাদের পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভবনা বেশি।"**

এই অংশ থেকেই পরিষ্কার যে ইসলাম বরং এক বিবাহই সমর্থন করে। কিন্তু প্রথাগত আইনজ্ঞরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন ইসলাম একই সময়ে একজন পুরুষের চারজন পর্যন্ত স্ত্রী থাকার বিষয়টি শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করে। শর্ত পূরণের কাজটি করতে হবে স্বামীকে। তারা মনে করেন শর্তের মধ্যে শুধু ভরণপোষণ এবং আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থাই অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে আধুনিক আইনজ্ঞরা বলছেন শুধু ভরণপোষণই নয়, বরং স্নেহ-মমতা ও গুরুত্বও সমানভাবে দিতে হবে, একজন মানুষের পক্ষে যা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কাজেই বলা যায় ইসলাম বহুবিবাহ নয়, বরং একক বিবাহই অনুমোদন করে এবং বহুবিবাহকে এক রকম নিষেধই করেছে। এই যুক্তির পক্ষে সুরাহ্ নিসার ১২৯ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করা যায় যেখানে বলা হয়েছেঃ

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে কখনোই সমান ব্যবহার করতে পারবে না।"

পবিত্র কোরাআন আরও বলে (সুরা নাবা, আয়াত-৮)t

"আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।"

তাহের মাহমুদ বহুবিবাহের বিষয়টি দেখেছেন এভাবে– 'কোরআনে বহুবিবাহের অনুমোদনের বিষয়টি একটি ব্যতিক্রম, একে নিয়ম বলা যাবে না' (Tahir Mahmood, An Indian civil Code and Islamic Law (Bombay, 1976) pp.87,88).

প্রণীত আইনে বহুবিবাহ

মুসলিম পারিবারিক আইন বহুবিবাহ অনুমোদন করলেও, The Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 -এর ধারা-২ (iia) এ বলা হয়েছে– মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের, ১৯৬১ এর বিধান লঙ্ঘন করে স্বামী যদি অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করে, তবে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি পাবেন। পরবর্তী সময়ে এই বিধান আরও সীমিত করা হয় পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ধারা-৬ এর মাধ্যমে। এতে বলা হয়েছেঃ

(1) No man, during the subsistence of an existing marriage, shall, except with the previous permission in writing of the Arbitration Council, contract another marriage, nor shall, any such marriage contracted without such permission be registered under the Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (LII of 1974).

(2) An application for permission under sub-section (1) shall be submitted to the chairman in the prescribed manner, together with the prescribed fees, and shall state the reasons for the proposed marriage, and whether the consent of the existing wife or wives has been obtained thereto.

(3) On receipt of the application under the sub-section (2), the Chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the Arbitration Council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant, subject to such conditions, if any, as may be deemed fit, the permission applied for.

(4) In deciding the application the Arbitration Council shall record its reasons for the decision, and any party may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision to the Assistant Judge concerned and his decision shall be final and shall not be called in question in any court.

(5) Any man who contracts another marriage without the permission of the Arbitration Council shall-

a. pay immediately the entire amount of the dower, whether prompt of deferred, due to the existing wife or wives, which amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue; and

b. on conviction upon complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand taka or with both.

অর্থাৎ আরবিট্রেশন কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়া এক বিয়ে বর্তমান থাকা অবস্থায়, দ্বিতীয় বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না, করলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ শর্ত আরোপের মাধ্যমে বহুবিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

এছাড়া পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর অধীনে প্রণীত ১৪ ও ১৫ বিধিতে আরো একটি বিবাহ করার সম্ভাব্য কারণসমূহ উল্লেখ আছে যা আরবিট্রেশন কাউন্সিল যুক্তিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করবে।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ কোরআনের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বিবেচনায় নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। কোরআনের ব্যাখ্যার আলোকেই তারা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিউনিসিয়া, মিসর, মরক্কো, তুরস্ক, ইরাক, যদিও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে শরীয়াহ্ আইনের উৎস একই। কিন্তু এর ধরণ, অবস্থা, প্রয়োগ ও অর্জন ভিন্ন। ইরাকে সেক্যুলার পারসোনাল স্ট্যাটিউট কোড গ্রহণ করা হয় ১৯৫৯ সালে। এরপর ১৯৭৮ সালে সংশোধনী এনে বহুবিবাহ নিষেধ করে দেওয়া হয়, যদি না প্রথম স্ত্রীর স্পষ্ট অনুমোদন থাকে। পরবর্তীতে অবশ্য অন্তবর্তীকালীন সরকার এই কোডটি ২০০৩ সনে বাতিল করে ধর্মীয় আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে তিউনিসিয়া। ১৯৬৬ সালে 'পারসোনাল স্ট্যাটিউট কোড'এ বহুবিবাহ সম্পূর্ণ নিষেধ করে দেওয়া হয়। সিরিয়া, তুরস্ক, জর্ডান, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়াও একবিবাহ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ যুক্ত করেছে তাদের আইনে। মরক্কো ২০০৩ সালের 'পারসোনাল স্ট্যাটাস ল'এর মাধ্যমে বেশ কয়েকটি কঠিন শর্ত আরোপের মাধ্যমে বহুবিবাহ কে বৈধতা দিয়েছে যেমন, কেবল আদালতের অনুমতি নিয়ে বহুবিবাহ করা যাবে। আর এ ক্ষেত্রে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা এবং যৌক্তিকতা বিবেচনায় নেবে (Valentina M. Donini Polygamy and Family Law, (http://www.resetdoc.org/story/00000001317) on line version visited on 31.01.2012)। মালয়েশিয়ার উচ্চ আদালতও এক বিবাহকে বাধ্যতামূলক করে বহুবিবাহকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করেছে (Dr. M. Shah Alam, In Pursuit of True Interpretation of the Islamic Scriptures to Promote Human Rights, ELOP Journal, Dhaka, 2008, P.24-45)।

মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত জরীপের ফলাফল

আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী, দ্বিতীয় বিয়ে করতে আরবিট্রেশন কাউন্সিলের অনুমতি লাগে। প্রথম স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আরবিট্রেশন কাউন্সিল দ্বিতীয় বিয়ের কারণ নিয়ে সন্তুষ্ট হলে অনুমতি প্রদান করবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরবিট্রেশন কাউন্সিলের অনুমতি না নিয়েই দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকে। আবার অনুমতি চাইলেও আরবিট্রেশন কাউন্সিল বাস্তব কারণ অনুসন্ধান না করেই সিদ্ধান্ত দেয়। এ বিষয়ে আইন কমিশন আরবিট্রেশন কাউন্সিলের ক্ষমতা কমিয়ে বরং সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত আরোপ করা যায় কিনা, সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের মতামত জানতে চেয়েছিল। উল্লেখ্য ১৯৬১ সনের আইনের বিধি ১৪ ও ১৫ তে কতিপয় শর্তের উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্নঃ বহুবিবাহের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্ত থাকার দরকার আছে কি?

মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
২৩৭	২১২	১৫	১০

এ বিষয়ে আইন কমিশনের মাঠ পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনাতেও একই ফলাফল উঠে আসে। তবে কী কী শর্ত আরোপ করা যায়, সে বিষয়টি নির্ধারিত হতে পারে আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচকবৃন্দ যেসব শর্তের ওপর জোর দেন তার মধ্যে রয়েছে প্রথম স্ত্রীর অনুমতির আবশ্যকীয়তার পাশাপাশি আদালতের অনুমতি নেয়া বা আর্থিক সঙ্গতি থাকা।

আলোচকরা জোর দিয়ে বলেন ওই শর্তগুলোর বাইরে অন্য যে কারণই থাকুক, এক স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার

দাম্পত্য অধিকার এবং কর্তব্য সাধনের মাধ্যমেই বিবাহিত জীবন শান্তিময় হয়। কোরআন ও হাদিস স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দয়া, মমতা ও ধৈর্য্যর কথা বলে। কোরআন শরীফে সুরা ৪ এর ১৯ আয়াতে বলা আছে ঃ

> O believers!.....Live with them (wives) on a footing of kindness and equity. If you dislike something in them may be that what you dislike, Allah may have kept in it a great deal of good.

দাম্পত্য সর্ম্পকের বিধানকে বিবাহিত জীবনের ইতিবাচক প্রতিবিধান মনে করা হয়, এর ফলে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বাস করেন এবং দাম্পত্য অধিকার পালন করেন। বৈধ বিয়ের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই স্ত্রী যদি স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করেন, তবে স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধারের মামলা করতে পারেন। ঠিক তেমনি স্ত্রীও পারেন স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করতে।

প্রচলিত শরীয়াহ্ আইন অনুসারে এটাই আশা করা হয়, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গেই বসবাস করবেন এবং তার সম্মতি ছাড়া আলাদা হবেন না। মুসলিম আইন মনে করে, স্ত্রী স্বামীর কাছে বাধ্য এবং স্ত্রী সব সময় স্বামীকে অনুসরণ করবে। একইভাবে স্বামীও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে না, এবং তার সঙ্গেই বসবাস করবে। কারও যদি এ অধিকার ক্ষুন্ন হয়, তবে এরও প্রতিকার আছে। বাংলাদেশ ও ভারত দু-দেশেই স্বামী বা স্ত্রী এ অধিকার আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন, যা 'দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার' নামেই বেশি পরিচিত।

ফায়েজী দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এভাবে– বিবাহের অন্যতম মূল নীতি হলো, দম্পতির একজন আরেকজনের সামাজিক ও অন্যান্য সুবিধার দিকে নজর রাখবে। যেখানে স্ত্রী কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই স্বামীর সঙ্গে থাকতে অস্বীকার করেন, সেখানে স্বামীর অধিকার আছে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলা করার। একইভাবে স্ত্রীরও অধিকার আছে স্বামীকে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার (Asaf A. A. Fyzee, Outlines of Muhammadan Law, 4th ed. Delhi, 1974. 121)। মুন্সী বজলুর রহমান এর মামলায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের ঢালাও অধিকারকে সীমিত ও শর্তযুক্ত করা হয়েছে (মুন্সী বজলুর রহমান বনাম শামসুন্নিসা বেগম, ১৮৬৭)ঃ

> A suit for restitution of conjugal rights will lie in a Civil court by a Mahommedan Husband to enforce his marital rights; and that in such a suit he would be entitled to decree for the return of his wife. But if there be cruelty to a degree rendering it unsafe for her to return to his dominion, or if there be a gross failure on his part to perform the obligations imposed on him by the marriage contract for the benefit of the wife, if properly proved, it would afford sufficient grounds for refusing the husband any relief in the suit

উল্লেখ্য যে, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অধিকার পবিত্র কোরআন বা হাদিস থেকেও উদ্ভূত নয়। মুসলিম বিবাহ চুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে বা স্বামী স্ত্রীর সাথে বসবাস না করা চুক্তি ভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়, যার প্রতিবিধান স্বরূপ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি এসেছে।

এই অধিকার শর্তহীন নয় এরং পারস্পরিক। বাস্তবে যদিও স্বামী স্ত্রী দুজনেরই এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই স্ত্রী তা প্রয়োগ করতে পারে, স্বামীর একচ্ছত্র বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার কারণে। এই অধিকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় শর্তহীন ভাবেই স্বামীরা এ অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়।

প্রণীত আইন, ডিক্রির বাস্তবায়ন এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত

আগে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি দেওয়ানি কার্যবিধি'র ১১৫ ধারা অনুযায়ী বিবেচনা করা হতো। ১৯৮৫ সালে ফ্যামিলি কোর্টস অর্ডিন্যান্স এর ধারা ৫-(বি)-তে এ বিষয়টি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারে আনা হয়। অর্থাৎ এ অধিকার লঙ্ঘিত হলে পারিবারিক আদালতে মামলা করা যাবে। দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলার প্রতিকার হলো এর ডিক্রি যার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে, সে যদি আদালতের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তবে তার সম্পত্তি জব্দ করা হবে। এই বিষয়টি বলা হয়েছে দেওয়ানী কার্যবিধিতেঃ

Where the party against whom a decree for the specific performance of a contract, or for restitution of conjugal rights, or for an injunction, has been passed, has had an opportunity of obeying the decree and has wilfully failed to obey it, the decree may be enforced in the case of a decree for restitution of conjugal rights by the attachment of his property, or in the case of a decree for the specific performance of a contract, or for an injunction by his detention in the civil prison, or by the attachment of his property, or by both (Order 21 rule-32 of Civil Procedure Code).

কিন্তু এর ফলে মামলা করার উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয় না। কারণ এভাবে ডিক্রি জারী করেও স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বসবাস করতে বাধ্য করা যায় না। মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার রায়ে বলেন মুসলিম বিয়ে একটি সামাজিক চুক্তি। এই সম্পর্ক সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা এবং সমঝোতার ওপর নির্ভর করে এবং যদি কোনো কারণে এ সমঝোতা, সহনশীলতা বা ন্যায়পরায়ণতা নষ্ট হয়, তবে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যেখানে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি, সেখানে স্বামী বা স্ত্রী দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের মামলা করতে পারেন এবং এই মামলায় যদি ডিক্রি হয়, তবে তার বাস্তবায়ন হতে পারে দায়িকের সম্পত্তি জব্দ করে নেওয়ার মাধ্যমে। তবে সমস্যা হয় দায়িক যদি স্ত্রী হন। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ মেয়েদের কোনো সম্পত্তি থাকে না। ফলে এ ক্ষেত্রে ডিক্রি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। আর আদালতের এমন কোনো রায় দেয়া উচিত না, যার কোনো বাস্তবায়ন নেই। কাজেই বলা যায়, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি আইনের একটি খারাপ অংশ (Khodeja Begum & Others Vs Md. Sadeq Sarker 18 BLD (1998) 31। দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আমাদের দেশের উচ্চ আদালতের বেশ কয়েকটি রায় আছে। উল্লেখযোগ্য মামলাগুলো হচ্ছে ঃ

'নেলী জামান বনাম গিয়াসউদ্দিন খান' মামলায় সিদ্ধান্ত হয়– দাম্পত্য সম্পর্কের পুনরুদ্ধারের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় এবং সার্বজনীন পলিসি এবং সংবিধানের পরিপন্থী (৩৪ ডিএলআর (১৯৮২) (হাইকোর্ট ডিভিশন) 221| মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হুসাইন বলেন সময়ের বিবর্তনে এবং সামাজিক ধারণার পরিবর্তনের কারণে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর সঙ্গে বসবাসে বাধ্য করার বিষয়টি এখন আর কার্যকর নয়। আর এটা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং পলিসির পরিপন্থী অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, আইনের সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, যা বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ এবং ৩১ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুরক্ষিত, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 'শারমিন হোসেন (রূপা) বনাম মিজানুর রহমান (তুহিন)' মামলাতেও একই সিদ্ধান্ত দিয়ে মাননীয় বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন– এই ধরনের মামলা আদালতে চলতে দেওয়া যায় না, যেহেতু এটি সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (১ বিত্রলডি (১৯৯৭) (হাইকোর্ট ডিভিশন) ৫০৯।

'খোদেজা বেগম এবং অন্যান্য বনাম মোঃ সাদেক সরকার' মামলায় মাননীয় বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল মান্নান রায় দেন এটি একটি অমানবিক আইন, যেখানে স্বামী বা স্ত্রীকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় (১৮ বিত্রলডি (১৯৯৮) (হাইকোর্ট ডিভিশন) ৩১। উপরন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের অধিকার বাস্তবায়ন করা যায় না। তিনি আরও বলেন দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়টি স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে বা স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করুক না কেন, এটা অবৈধ এবং বাতিল আইন এবং এর অধীনে কোনো মামলা আদালতে চলতে পারে না।

'মোঃ চান মিয়া বনাম রূপ নাহার' মামলায় মাননীয় বিচারপতি কাজী এ টি মনোয়ারউদ্দীন আগের ৩টি মামলা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রায় দিয়ে প্রথাগত আইনকে প্রতিষ্ঠা করে বলেন 'দাম্পত্য স্বত্ব পুনরুদ্ধারের অধিকার পারস্পরিক এবং এটি বৈষম্যমূলক নয় বা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়' (৫১, ডি.আন.আর (১৯৯৯) (হাইকোর্ট ডিভিশন) ২৯২। তবে তিনি এটাও বলেন যাই হোক না কেন, আদালতের দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার বিষয়ে ডিক্রি দেওয়া উচিত না, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমঝোতাই নেই এবং তা বাস্তবায়ন করাও অবাস্তব ও অসম্ভব। 'হোসনা জাহান (মুন্না) বনাম মো.

শাহজাহান (সাপু) এবং অন্যান্য' মামলাতেও আগের প্রথাগত আইনের প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায় (৫১ ডিএলআর (১৯৯৯) (হাইকোর্ট ডিভিশন) ২৯৫)।

এ সংক্রান্ত মামলাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উচ্চ আদালত দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে একমত হননি। যদিও কোন কোন আদালত মামলা চলবে বলে রায় দিয়েছেন আবার কোন কোন আদালত রায়ে বলেছেন এধরনের মামলা চলতে পারে না তবে একটি বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়েছেন, তা হলো স্ত্রীকে স্বামীর সাথে বসবাস করার জন্য বাধ্য করা যায় না এবং এ ধরণের মামলায় ডিক্রি হলে তার বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না।

যেহেতু এ বিষয়ে আদালতে সংঘাতপূর্ণ রায় আছে এ বিষয়ে আইন করার প্রয়োজন রয়েছে। ডিক্রিজারীর অবাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে এবং কোরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু না থাকায় বিধানটি বাতিলের পক্ষেই যুক্তি বেশি।

মাঠ-পর্যায়ে প্রাপ্ত জরীপের ফলাফল

দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিধান থাকা উচিত কিনা, সে বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়ঃ

প্রশ্নঃ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিধানটি পারিবারিক আইনে থাকার দরকার আছে?

মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
২৩২	৫০	১৬৬	১৯

এ বিষয়ে আইন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের ফোকাস গ্রুপের আলোচনাতেও একই ফলাফল উঠে আসে। প্রত্যেকেই একমত প্রকাশ করে বলেন, এই বিধানটি ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং সেদিক থেকে সংবিধানও লঙ্ঘন করেছে। বিধানটি 'ফ্যামিলি কোর্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫' এ থেকে বাদ দেয়া উচিত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

প্রচলিত শরীয়াহ্ আইনে, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ পুরুষ কোনো কারণ ছাড়াই বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন। তবে শিয়া আইনে প্রাপ্তবয়স্ক বা সুস্থতার পাশাপাশি উপযুক্ত কারণও থাকতে হয় (I.B. Mulla, Commentary on Mohammedan Law, 2nd Ed. Published by Dwivedi Law Agency, Allahabad, 2009)। বিবাহ বিচ্ছেদের নানা পদ্ধতি থাকলেও, শরীয়াহ্ আইন অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষদের একচ্ছত্র অধিকার বিদ্যমান। তবে স্বামীরা ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। কিন্তু এটি স্বামীর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকাই বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট। প্রাক-ইসলামি যুগে মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। কোরআনেই প্রথম স্ত্রীদের এই ক্ষমতা দেয়। তখন স্ত্রীরা খুলা (Khula) এবং মুবারা (Mubaraat) এই দু-পদ্ধতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারত, যদিও এটি মূলত দুপক্ষের সম্মতির ওপরও নির্ভর করে। সনাতন হানাফি আইন অনুযায়ী খুলা পদ্ধতিই ছিল স্ত্রীদের বিবাহ-বিচ্ছেদ পাওয়ার একমাত্র উপায়। এর মাধ্যমে বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দুজনেই একমত হতো । তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো স্ত্রীকে তার স্বাধীনতা স্বামীর কাছ থেকে ক্রয় করতে হতো। ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অর্থনৈতিক সুবিধা বা স্বামীর প্রতিশ্রুত দেনমোহরের কিছু অংশ ছাড়তে হতো। আমীর আলী এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন- তালাকের এ পদ্ধতিটি খুব কম সময়ই স্ত্রীরা ব্যবহার করতে পারে, কারণ তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এমনকি সে তার ভরণপোষণ থেকেও বঞ্চিত হয়, যদি না তখন সে গর্ভবতী থাকে (সৈয়দ আমীর আলি, মোহমেডান ল, ৫ম সংস্করণ, ভলিউম-২, ১৯৮৫, ২৬৯)। প্রিভি কাউন্সিল তুতিফুননেসা'র মামলায় বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছে (মুন্সী বজলুর উল রহিম বনাম তুতিফুননেসা, ৮ এম আই এ, ৩৭৯, উদ্ধৃত আনিসুর রহমান, ডেফেলপমেন্ট অব মুসলিম ফ্যামিলি ল ইন বাংলাদেশঃ এম্পাওয়ারমেন্ট অর স্ট্রেমলাইনিং অব ওম্যান)ঃ

From that time, the Appellant did everything he could to get rid of the Respondent, treating her with great harshness, refusing to permit her to see her mother, denying her food and clothing adequate to her station, in the hope of inducing her to ask for a divorce, by which she would forfeit her right in respect of her dower.

তালাকের মুবারা পদ্ধতিতেও স্বামী-স্ত্রী দুজনের সম্মতি লাগে। এ ক্ষেত্রেও স্ত্রীর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। পরবর্তীতে নারীদের 'তালাক-ই-তাওফিজ'-এর অধিকার দেওয়ার মাধ্যমে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে স্বামীরা এ ধরণের তালাকের অধিকার স্ত্রীদের দিলে, তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে।

প্রণীত আইন

এই অসম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয় Dissolution of Muslim Marriages Act (1939) ধারা ২ এর মাধ্যমে। এ আইনে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র যোগ করা হয়, যেখানে স্ত্রীরাও চাইলে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন। এগুলো হচ্ছে ঃ

- যদি স্বামী ৪ বছর নিরুদ্দেশ থাকেন;
- যদি স্বামী ২ বছর স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে অসমর্থ হন;
- যদি স্বামী মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর বিধান ভঙ্গ করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন;
- যদি স্বামী ৭ বছর বা তার বেশি কারাদন্ডে দন্ডিত হন;
- যদি স্বামী কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ৩ বছর বৈবাহিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন;
- যদি স্বামী বিয়ের সময় অক্ষম হন এবং আরোগ্য লাভ না করেন;
- যদি স্বামী ২ বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন থাকেন, অথবা কুষ্ঠ কিংবা অন্যকোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন;
- যদি বাল্যকালে পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহিত হন, তবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী ১৮ বছর বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর, ১৯ বছর বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই বিয়ে পরিত্যাগ করতে পারেন, তাদের মধ্যে সহবাস না হওয়া সাপেক্ষে;
- যদি স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে (কী কী কাজ নিষ্ঠুর আচরণ হবে, তার ব্যাখ্যা রয়েছে এ আইনে);
- অথবা অন্য কোনো কারণ, যা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত

এসব কারণের যেকোনো এক বা একাধিক কারণে স্ত্রীরা বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকারী হন এবং এ জন্য তাকে স্বামীর কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এরপর আইন আরও একধাপ এগিয়েছে। শুধু স্ত্রীদের ক্ষমতাই নয়, স্বামীদের ইচ্ছামাফিক বিবাহ-বিচ্ছেদ করার অধিকার যেন যথেচ্ছ প্রয়োগ না করা হয়, সে জন্য The Muslim Family Laws Ordinance, 1961-এ ধারা ৭ এ বিধান করা হয়েছেঃ

> (1) Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever, give the Chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife.
>
> (2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be paunishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to ten thousand taka or with both.....

অর্থাৎ শুধু মুখে বললেই হবে না, তালাক কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ পরিবর্তন আনা হয়েছে পুরুষদের একচ্ছত্র অধিকার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য। তবে এ ধারার মাধ্যমে শুধু তালাক কার্যকর হয়েছে কি-না, সেটিই বিবেচনা করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। সংবিধানের এই নীতি কোরআন ও হাদিসের মূল ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে কোরআন ও সুন্নাহর সনাতনী ব্যাখ্যার কারণেই পারিবারিক আইনের কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধানের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আর এ ক্ষেত্র থেকে উত্তরণের উপায় কোরআন ও সুন্নাহর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বা বিচার বিভাগীয় যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ এবং এর মাধ্যমে পারিবারিক আইনের সংস্কার সাধন।

মাঠ-পর্যায়ে প্রাপ্ত জরীপের ফলাফল

প্রশ্নঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত কি?

মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
২৩৭	৮৫	৯	৪

আইন কমিশনের মাঠ পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপের আলোচনাতেও বিষয়টি উঠে আসে এভাবে- পুরুষদের বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যে একচ্ছত্র অধিকার বিদ্যমান সেখানে কিছু শর্ত দেয়া উচিত, যাতে তাদের ইচ্ছামাফিক তালাক দেয়ার প্রবণতা কমে। সেই সাথে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তালাক-ই-তাত্তফিজ এর বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা উচিত বলে তারা মত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এই অধিকারটি স্ত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে। তাহলে নারী-পুরুষের সমান অধিকারে কিছুটা ভারসাম্য আসবে।

ভরণপোষণ

ভরণপোষণ বলতে কেবলমাত্র খাদ্য, বস্ত্র বা বাসস্থানকেই বোঝায় না বরং এর অর্থ আরও ব্যাপক, যেমন, সন্তানদের ক্ষেত্রে তার শারীরিক-মানসিক সুষ্ঠু বিকাশের জন্য তার সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে যা যা প্রয়োজন সবই তার ভরণপোষণের আওতাভুক্ত। মুসলিম আইনে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী এবং রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে সন্তান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতাও ভরণপোষণের অধিকারী হন। ভরণপোষণ পাওয়া স্ত্রীর আইনগত অধিকার। এই অধিকার কেবলমাত্র বিবাহ বলবৎ থাকাকালীন সময়েই প্রযোজ্য হয় না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের পরও যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য এই বাধ্যবাধকতা বলবৎ থাকে।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। এই সময়ে স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবেন এই বিষয় নিয়ে কোন ভিন্নমত না থাকলেও ইদ্দতকালীন সময়ের পর স্ত্রীকে আর ভরণপোষণ দেয়া হবে কি-না সে বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। আবার সুরা বাকারার আয়াত ২৪১ এ- মাতা (mata) দেয়ার বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাতার অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে হেফজুর রহমানের মামলায়, এর অর্থ উপহার, যা ইদ্দত কালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দেয়া হয় (51 DLR (1999) AD, P-200)। কিন্তু ভরণপোষণ এবং মাতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

প্রণীত আইন

মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ তে বলা হয়েছে স্বামী যদি পর্যাপ্তভাবে স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে না পারে কিংবা যদি একাধিক স্ত্রী হয় তবে সমহারে ভরণপোষণ করতে ব্যর্থ হয় তবে আরবিট্রেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বরাবর নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত করতে হবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা স্বামী বা স্ত্রী ক্ষুব্ধ হলে তারা সরাসরি সহকারী জজ

আদালতে রিভিশন আবেদন করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে সহকারী জজের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। পরবর্তীতে The Family Courts Ordinance, 1985 এর ধারা ৫ (ডি) এর মাধ্যমে ভরণপোষণ বিষয়টি সরাসরি পারিবারিক আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা হয়।

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত

ভরণপোষণ বিষয়ে আমাদের বিচার বিভাগের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রায় আছে। রুস্তম আলী বনাম জমিলা খাতুন মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত (৪৩, ডিএলআর (১৯৯১) হাইকোর্ট বিভাগ) পরিবর্তন করে আপিল বিভাগ রায় দেন যে অতীত ভরণপোষণ পাওয়ার জন্য কোন রকম পূর্ব শর্তের প্রয়োজন নেই। বিবাহ বিচ্ছেদ পরবর্তী ভরণপোষণ সম্পর্কেও আমাদের দেশে হেফজুর রহমান বনাম শামসুন নাহার মামলায় সিদ্ধান্ত হয়, বিবাহ বিচ্ছেদের পর ইদ্দত কালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে বাধ্য থাকবেন যদি না স্ত্রী পুনঃবিবাহ করেন (৪৭ ডিএলআর (১৯৯৫) হাইকোর্ট বিভাগ)। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে (সুরা ২ আয়াত ২৪১)ঃ

> for divorced women maintenance should be provided on a reasonable scale. This is a duty on the righteous.

পরবর্তীতে আপিল বিভাগ এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে রায় দেন কেবলমাত্র ইদ্দতকালীন সময়েই স্ত্রী ভরণপোষণ পেতে অধিকারী হবেন। কিন্তু সাথে এও বলেন, মাতা বা ভরণপোষণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা ইদ্দতের পরেও সম্প্রসারিত করলে শরীয়াহ্ বিরোধী হবে না।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ

বিবাহ বিচ্ছেদের পর কতদিন পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে বাধ্য থাকবেন এ বিষয়ে ভারতের উচ্চ আদালত বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রায় প্রদান করেন। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট মো. আহমেদ খান বনাম শাহ বানু বেগম মামলায় রায় দেন তালাকের পরও একজন মহিলা তার দ্বিতীয় বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বের স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পেতে অধিকারী হবেন, যদি তিনি নিজের ভরণপোষণ নিজে বহন করতে অসমর্থ হন (এ আই আর (১৯৮৫) এস সি ৯৪৫)। মামলায় আদালত এই যুক্তি প্রদান করেন যে, যেক্ষেত্রে স্ত্রী নিজের ভরণপোষণ করতে পারে না সেই ধরণের ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। রায়ের কার্যকারিতা লোপ করে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয় এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়। এরপর ২০০১ সালে ড্যানিয়েল লতিফি'র মামলায় ইদ্দতকালীন সময়ের পরও স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়ার বিষয়ে রায় দেয়া হয় (ড্যানিয়েল লতিফি এবং অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (2001) 7SCC,740)। এখানে বলা হয় মুসলিম স্বামী তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য তার ভরণপোষণের বিষয়টিও বিবেচনা করবেন।

শাহবানু এবং ড্যানিয়েল লতিফির মামলার মতোই আমাদের দেশে হেফজুর রহমান মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের রায় ছিল প্রগতিশীল। এই মামলার রায়ে আপীল বিভাগ অন্যান্য মুসলিম দেশের উদাহরণ বর্ণনা করার সময় বলেন, যে স্ত্রীকে তার স্বামী ইচ্ছামাফিক তালাক প্রদান করে, তাকে মাতা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে। জর্ডান, মিশর এবং সিরিয়ায় যথাক্রমে ১,২ এবং ৩ বছরের ভরণপোষণ মাতা হিসেবে দেয়ার বিধান দিয়ে আইন প্রণয়ণ করা হয়েছে (Anisur Rahman, Unlocking the gate of ijtihad, Hefzur Rahman revisited, in Dr. Salimullah Khan ed, Stamford Journal of Law, Number 2 March 2011, p.160), অর্থাৎ অনেক মুসলিম দেশেই এ বিষয়ে আইন করা হয়েছে।

মাঠ-পর্যায়ে প্রাপ্ত জরীপের ফলাফল

প্রশ্নঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণ দেয়ার বিধান করা যায় কি?

মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
২৩৭	৬৯	৯৮	৪৭

কমিশনের ফোকাস গ্রুপ এর আলোচনাতে এই বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ পায় এবং তারা জোর দিয়ে বলেন অতীত (বকেয়া) ভরণপোষণের পক্ষে আমাদের উচ্চ আদালতের নজির আছে। কাজেই বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে এবং এর প্রয়োজন নিশ্চিত করতে আইনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কিন্তু ইদ্দত পরবর্তী ভরণপোষণের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে এই পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে বলে তারা মত প্রকাশ করেন। তবে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ভরণপোষণ দেয়ার বিষয়টিতে সবাই নিরুৎসাহিত করেছেন।

অভিভাবকত্ব ও হেফাজত

নাবালক সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা প্রথমত মায়ের ওপর বর্তায়। এ বিষয়ে কোন ভিন্নমত নেই। যদি মা কোন কারণে সন্তানের হেফাজতকারী হতে অস্বীকার করেন বা অপারগতা প্রকাশ করেন, তবে সে ক্ষেত্রে তার মাতৃ সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় যেমন, নানী হেফাজত কারার অধিকারী হবেন। এটি প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ আইন। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়

১। মা কতদিন হেফাজত করার অধিকারী হবেন ?

২। মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের ফলে এই ক্ষমতা ক্ষুন্ন হবে কি-না ?

৩। বিয়ে বলবৎ থাকাকালীন সময়ে মা আলাদা বসবাস করলে তার হেফাজত করার ক্ষমতা থাকবে কি-না ?

মা কতদিন হেফাজত করতে পারবেন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ রয়েছে। হানাফী স্কুল মনে করে ছেলের ৭ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত মা হেফাজত করার অধিকারী হবেন। অন্যদিকে মালিকী স্কুল মনে করে, ছেলে বয়ঃসন্ধি কাল পর্যন্ত এবং মেয়ের বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মা হেফাজত করার অধিকারী হবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, শাফি এবং মালিকী স্কুলে নাবালক ছেলে মেয়েদেরকেই সুযোগ দেয়া হয়েছে তার হেফাজতকারীকে খুঁজে নেয়ার।

নাবালক সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদের পরও বর্তমান থাকে। তবে কয়েকটি কারণে মায়ের এই ক্ষমতা ক্ষুন্ন হতে পারে। উচ্চ আদালতের নজীর বলে, হেফাজত এর ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থ সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে 'Welfare doctrine এর প্রচলন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যদিও হেফাজতের ক্ষেত্রে মায়েদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে এখনও প্রচলিত আইনই অনুসরণ করা হয় যেখানে মায়েদের অবস্থান অপেক্ষাকৃত নীচে।

অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পিতাই সন্তানের আইনগত অভিভাবক নিযুক্ত হন। তার অবর্তমানে তার ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তি, যদি এরকম ব্যক্তি না থাকে তবে তার অবর্তমানে নাবালকের দাদা আর দাদার অবর্তমানে দাদার ইচ্ছাপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত ব্যক্তি নাবালকের অভিভাবক নিযুক্ত হবেন। তবে অভিভাবকত্ব আইন সন্তানের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে অভিভাবকত্ব নির্ণয়ের বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে নির্ধারণ করার সুযোগ রেখেছে। The Guardians and Wards Act, 1890 এর ধারা-৭ এ বলা হয়েছেঃ

Where the Court is satisfied that it is for the welfare of minor that order should be made-

(a) appointing a guardian of his person or property, or both, or

(b) declaring a person to be such a guardian, the court may make an order accordingly.

(1)An order under this section shall imply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the Court.

(2)Where a guardian has been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court, an order under this section appointing or declaring another person to be guardian in his stead shall not be made until the powers of the guardian appointed or declared as aforesaid have ceased under the provisions of this Act.

এই আইনের ১৭ ধারায় আরো বলা হয়েছেঃ

(1) In appointing or declaring the guardian of a minor, the Court shall, subject to the provisios of this section, be guided by what, consistently with the law to which the minor is subject, appears in the circumstances to be for the welfare of the minor.

(2)In considering what will be for the welfare of the minor, the Court shall have regard to the age, sex and religion of the minor, the character and capacity of the proposed guardian and his nearness of kin to the minor, the wishes, if any, of a deceased parent, and any existing or previous relations of the proposed guardian with the minor or his property.

(3) If the minor is old enough to form an intelligent preference, the Court may consider that preference.

(5) The Court shall not appoint or declare any person to be a guardian against his will.

'Welfare' e\ কল্যাণ অর্থ হলো বস্তুগত এবং আত্মিক উভয় ধরণের কল্যাণ। নৈতিকতা এবং ধর্মীয় কল্যাণের সাথে সাথে নাবালকের সাথে প্রস্তাবিত ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তার জন্য কল্যাণকর হবে (শওকত মাহমুদ এবং নাদিম শওকাত, গার্ডিয়ান এন্ড ওয়ার্ড্ড এ্যাক্ট এন্ড মেজরিটি এ্যাক্ট, প্রকাশিত লাহোর, ১৯৯৩, পৃ-১৪)।

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের অগ্রগামীতা

আমাদের দেশে নাবালকের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত সংক্রান্ত বিষয় অভিভাবকত্ব আইন ১৮৯০ এবং মুসলিম পারিবারিক আইন বা শরীয়াহ্ দিয়েই পরিচালিত হয়। প্রচলিত শরীয়াহ্ আইনের বাইরে এসে সন্তানের স্বার্থ সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে আমাদের দেশের উচ্চ আদালত যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আবুবকর সিদ্দিকি বনাম এস. এস. এ বকর মামলায় ছেলে বয়স ৭ অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মাকে সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা দেন (৩৮ ডিএলআর আপীল বিভাগ, ১০৬)।

আবার মা যদি অন্য কাউকে বিবাহ করেন তবে সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা এবং অভিভাবকত্ব হারান এই নীতি থেকেও আমাদের বিচার বিভাগ সরে এসে রায় দিয়েছেন জোহরা বেগম বনাম মাইমুনা খাতুন, মামলায় (১৬ ডিএলআর ১৯৬৪)। এখানে বলা হয়েছে কেবলমাত্র কোন আগুন্তককে বিয়ে করলেই মা তার সন্তানকে হেফাজত করার ক্ষমতা হারাবেন তা নয় বরং পরিস্থিতি বিবেচনায় মাকে সন্তানের অভিভাবকও ঘোষণা করা যায়।

অভিভাবকত্ব আইন অনুযায়ী পিতাই সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক। কিন্তু কোন কারণে যদি পারিবারিক আইন এবং সন্তানের স্বার্থ এর মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তবে, সে ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থই প্রাধান্য পাবে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় আয়েশা

খাতুন বনাম মেজর সাব্বির আহমেদ মামলায় (৮৩ ডিএলআর, (১৯৯৪)৩৯৯)। মোছাঃ জোহরা বেগম বনাম লতিফ আহমেদ মনোয়ার মামলার রায়ে বলা হয় আইনজ্ঞদের মধ্যে হেফাজত করার বিষয়ে কোন ঐকমত্য নেই বরং তাদের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত দেখা যায় (পিএলডি, ১৯৬৫(ওয়েস্ট পাকিস্তান),৬৯৫)। আবার পবিত্র কোরআন বা সুন্নাহ'য় এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা নেই বিধায় এ থেকে বেরিয়ে এসে সন্তানের স্বার্থ রক্ষার্থে সিদ্ধান্ত দেয়া যায় এবং সেই মতে মাকে সন্তানের হেফাজত করার ক্ষমতা অর্পণ করা যায়।

অভিভাবকত্বের বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র এবং অনুসরণীয় সিদ্ধান্ত দেয়া হয় রেহানুদ্দিন বনাম আজিজুন নাহার মামলায় (৩২ডিএলআর (১৯৮১)| মুসলিম আইন মোতাবেক পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা নাবালকের স্বাভাবিক অভিভাবক কিন্তু এই মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে মাকে সন্তানের অভিভবকত্ব দেয়া হয়।

নাবালকের হেফাজতের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারকে এতটাই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে হেফাজতের অধিকার স্বামীকে প্রদান করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও নারগিস সুলতানা বনাম মোঃ আমিরুল বর চৌধুরী মামলায় বিচারক সন্তানকে মায়ের হেফাজতে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেন (1998,18BLD,HCD, 343)।

অভিভাবকত্ব আইনে সন্তানের স্বার্থ বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা আদালতের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। সেখানে আদালত অবস্থা এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সন্তানের স্বার্থ সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। তবে প্রচলিত আইনও বর্তমান থাকায় এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বিধিবদ্ধ আইনের প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশন, ১৯৮৯ এ, বাংলাদেশ যার স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র, অভিভাবকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থকে বিবেচনায় নেয়ার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ

অন্যান্য মুসলিম দেশে সন্তানের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে পিতা মাতাকে দেখে নয়, বরং কার কাছে থাকলে সন্তানের মঙ্গল হবে, সে বিষয়টিতেই অধিক নজর দিয়েছে। যেমন তিউনিসিয়ায় মায়ের পক্ষে হেফাজতে সন্তানের কোন বয়সসীমা নেই।

প্রশ্নঃ সন্তানের স্বার্থকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে হেফাজত এবং অভিভাবকত্ব নির্ধারণে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োজন আছে কি?

মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
২৩৭	১৭৪	৫৬	১৭

এ বিষয়ে ফোকাস গ্রুপ- এর আলোচনাতে আলোচকবৃন্দ মত প্রকাশ করে বলেন যে, বাবা না থাকলে সন্তানের মা নাবালকের শরীর ও সম্পত্তির অধিকার পাবেন। তবে পিতা-মাতা উভয়ে বর্তমান থাকলে অভিভাবকত্ব ও হেফাজতের ক্ষেত্রে পিতা মাতার সন্তানের ওপর সমান অধিকার থাকবে। তবে সন্তানের স্বার্থই সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিতে আদালতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে তারা মত প্রকাশ করেন।

দত্তক

নিঃসন্তান দম্পতির সন্তানের আকাঙ্খা শ্বাশত। সুস্পষ্ট আইনগত স্বীকৃতি না থাকলেও বাস্তবে নিঃসন্তান মুসলিম দম্পতি সন্তান পালক নিচ্ছেন এবং পালক সন্তানের পরিচয় গোপন করে নিজের সন্তান হিসেবে বড় করছেন। এ কারণে বিষয়টির আইনগত রূপ দেয়া গেলে এর সামাজিক স্বীকৃতিও জোরদার হবে। এতে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র সরাসরি লঙ্ঘনও হবে না। পবিত্র কোরআনের দত্তক বিষয়ক সুরাহ্ ৩৩/৪-৫ এ বলা হয়েছেঃ

"আল্লাহ্ কোন মানুষের দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নি। তোমাদের স্ত্রীরা যাদের সাথে তোমরা জিহার করেছ (মা বলে ডেকেছ), তাদেরকে তিনি তোমাদের মা করেননি; আর পোষ্যপুত্র যাদেরকে তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো কেবল তোমাদের মুখের কথা। সত্য কথা আল্লাহ্ই বলেন, আর তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।"

"তোমরা ওদেরকে ডাকো ওদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এ-ই ন্যায়সংগত। যদি তোমরা ওদের পিতার পরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মের ভাই বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো। এ- ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন ত্রুটি হবে না, কিন্তু ইচ্ছা ক'রে করলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

উপরিউক্ত আয়াত দুইটিতে সহজ সত্য উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দত্তক গ্রহণের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কোন ব্যক্তির দত্তকী সন্তানের নিজের ঔরসজাত বা গর্ভের সন্তানের মত আইনগত মর্যাদা নেই। পবিত্র কোরআন পোষ্যপুত্র বা কন্যার বাস্তবতা ও সংবেদনশীলতা স্বীকার করে এ বিষয়ে ক্ষমাশীলতার কথা উল্লেখ করেছে।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবে দত্তক প্রথা প্রচলিত ছিল। কোরআন ও হাদীসে অসহায় ও এতিম শিশুদের দেখাশুনা করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে কাফালা (kafalah) যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে খাওয়ানো বা প্রতিপালন করা তার মাধ্যমে দত্তকের বিকল্প চালু আছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুরা তার নিজের পরিবার ছাড়া ভিন্ন পরিবারে প্রতিপালিত হয় যদিও সেই ভিন্ন পরিবারের নাম বা পদবি সে গ্রহণ করতে পারে না। আলজেরিয়ায় আইনে কাফালা বলতে একজন পিতা যেভাবে তার সন্তানকে লালন পালন করে সেভাবে অন্য কারোর সন্তানকে বিনা টাকায় শিক্ষা, নিরাপত্তা ও লালন পালনে তার দায়-দায়িত্বকে বুঝায়। এভাবে অসহায় ও এতিম সন্তানকে প্রতিপালনের প্রতি মুসলিম সমাজে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে দত্তক সংক্রান্ত কোন রাষ্ট্রীয় আইন নেই। যুদ্ধ-শিশুদের (war babies) বৈধভাবে দত্তক দেয়ার জন্য The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Order, 1972 নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৮২ সনে এই আইনটি বাতিল হওয়ার আগ পর্যন্ত বহু পরিত্যাক্ত শিশুকে সে আইনের অধীন দত্তক দেয়া হয়েছে। শিশু পাচার বা ধর্মান্তরিত করণের আশংকায় এই আইনটি বাতিল করা হয়েছিল। তবে এর মাধ্যমে এটি বলা যায় রাষ্ট্রীয় আইন প্রচলনের মাধ্যমে দত্তক দেয়া বা নেয়ার উদাহরণ এই বাংলাদেশেই সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে পালক, দত্তক বা পোষ্যপুত্রের অনুরূপ দত্তকের বিষয়টি চালু আছে, তবে পালক সন্তান আইনত উত্তরাধিকারী না হওয়ায় তাকে সাধারণত দানপত্রের মাধ্যমে সম্পত্তি দেয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি এমন একটি বাস্তবতা যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমাদের পারিবারিক আইনে দত্তক এর বিধান অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও অভিভাবকত্ব আইন রয়েছে। অভিভাবকত্ব এবং দত্তক এক নয়। অভিভাবকত্ব আইন এর মাধ্যমে দত্তক ব্যবস্থা কিছুটা প্রচলিত হলেও মূলতঃ এই আইনের জটিলতার কারণে মানুষ এই আইনের সাহায্য প্রার্থনায় উৎসাহিত হয় না। এই আইনের জটিল দিকগুলো হলো এ ক্ষেত্রে যাকে প্রতিপালনের জন্য নেয়া হয় তার পিতামাতা হিসেবে অভিভাবকত্ব গ্রহণকারীদের পরিচয় দেয়া যায় না। অর্থাৎ সন্তানের অভিভাবক হিসেবে আদালত তাদের অনুমতি দিতে পারে, কিন্তু তার জন্মদানকারী পিতামাতার নাম অক্ষুণ্ন থাকবে। অভিভাবকত্ব আইনে অভিভাবকত্ব প্রাপ্তির বিষয়টি নিস্পত্তি হলেও দত্তক নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ কারণে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নিঃসন্তান দম্পত্তি দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের আইনের অগোচরে কিনে নেয়। অথবা দরিদ্র আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে সন্তান নিয়ে নিজের সন্তান হিসেবে লালন পালন করতে থাকে। তারপরেও আইন না থাকার কারণে এই পালিত সন্তান তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। এমন কি পালক পিতামাতার নামও আইনত গ্রহণ করতে পারে না।

ইন্দোনেশিয়ায় মুসলিম আইনকে বিধিবদ্ধ করার সময় দত্তককে প্রচলিত আইনের আলোকে ভিন্ন রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে দত্তক সন্তানকে Obligatory bequest এর মাধ্যমে সম্পত্তি প্রদান করা যায়। অনুরূপভাবে দত্তক পিতামাতাও দত্তক সন্তানের সম্পত্তি থেকে অংশ পায়। ২০০১ সনে তুরস্কে সিভিল কোডের মাধ্যমে কিছু শর্ত যোগ করে

দত্তক প্রথার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এখানে অবিবাহিত ব্যক্তির বয়স ৩০ বছর হলে সে দত্তক নিতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কোন দম্পতিকে দত্তক নিতে হলে তাদেরকে যৌথভাবে দত্তক নিতে হবে এমন বিধান করা হয়েছে। এভাবে তুরস্কে দত্তককে স্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তিউনেসিয়ায় দত্তক সন্তানকে তার দত্তক পিতার নাম গ্রহণের অধিকার পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। উপরন্তু সেখানে দত্তক সন্তানের তার দত্তক পিতার সাথে প্রকৃত পিতা পুত্রের মত একই রকম দায়িত্ব ও অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। আলজেরিয়াতে শরীয়াহ্ মতে দত্তক নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা সত্বেও আর্থিকভাবে সম্পন্ন লোক চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আদালত বা নোটারি পাবলিকের সম্মুখে হলফনামার মাধ্যমে দত্তক নিতে পারে। এমনকি দত্তক সন্তানকে তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ প্রদান করতে পারে।

পিতা-মাতার সম্মতিতে দত্তক প্রদান বা কোন এতিম শিশুকে আইনের অধীন দত্তক নেয়া আইনগত স্বীকৃতি পেলে সন্তানের আইনগত মর্যাদা বা অবস্থান নিশ্চিত হবে, যা তার পরিচয়ের জন্য অপরিহার্য, এবং অন্যদিকে দত্তক গ্রহীতা পিতা-মাতাও পিতা-মাতা হিসেবে আইনগত মর্যাদা লাভ করবেন। এটি সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গেঁ সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কোরআন বা সুন্নাহ্ এটি নিষেধও করেনি। প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনে দত্তকী সন্তান কোন সম্পত্তি পাবে না। অতএব দানের মাধ্যমে তার বৈষয়িক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা যাবে।

মাঠ-পর্যায়ে প্রাপ্ত জরীপের ফলাফল

আমাদের দেশে দত্তকের প্রচলন রয়েছে পালক পুত্র/কন্যা নামে। । মাঠ পর্যায়ে দত্তকের বিষয়ে বেশ কয়েকটি তথ্য জনতে চেয়ে প্রশ্ন করা হয়। অধিকাংশ উত্তরদাতা মুসলিম আইনে দত্তক সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত, দত্তক ছেলেমেয়েদের সম্পত্তিতে অংশ দেয়া উচিত এবং পারিবারিক আইনে এর বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত বলে মন্তব্য করেন।

প্রশ্নঃ মুসলিম আইনে দত্তক সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত কি?

মোট উত্তরদাতা	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই
২৩৭	২০২	২৭	৮

এ বিষয়ে ফোকাস গ্রুপ এর আলোচনাতে আলোচকদের একজন বলেন, শরীয়া আইন দত্তক অনুমোদন করে না। কিন্তু অধিকাংশ আলোচকবৃন্দ মনে করেন শরীয়াহ্ আইনে বিষয়টি সরাসরি নিষেধ করা নেই বরং কিছু শর্ত দেয়া আছে। কাজেই বর্তমান আইনে এর অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে দত্তক সন্তানকে উত্তরাধিকার দেয়ার বিষয়ে তারা বলেন- তাদের উত্তরাধিকার দেয়ার প্রয়োজন নেই বরং সামাজিক সুরক্ষার কথা চিন্তা করে আইন করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি উইল করে বা দান করে দেয়াটা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937-এ দত্তকের পক্ষে পরোক্ষ (indirect, implied, tacit) সমর্থন দেখা যায়। এই আইনের ধারা-২ এ শরীয়াহ্ প্রয়োগের ক্ষেত্র বা বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার পর ধারা-৩ এ বলা হয়েছেঃ

Power to make a declaration— (1) Any person who satisfies the prescribed authority—

(a) that he is Muslim, and

(b) that he is competent to contract within the meaning of section 11 of the Contract Act, 1872, and

(c) that he is a resident of [Bangladesh], may be declaration in the prescribed form and filed before the prescribed authority declare that he desires to obtain the benefit of [the provisions of this section], and thereafter the provisions of section 2 shall apply to the declarant and all his minor children and their descendants as if in addition to the matters enumerated therein adoption, wills and legacies were also specified.

(2) Where the prescribed authority refuses to accept a declaration under sub-section (1), the person desiring to make the same may appeal to such officer as the [Government] may, by general or special order, appoint in this behalf, and such officer may, if he is satisfied that the appellant is entitled to make the declaration, order the prescribed authority to accept the same.

আক্ষরিক ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যার পরিণাম হিল্লাহ্ বিবাহ বিভ্রান্তি

কোন ধর্মগ্রন্থের টেক্সটের আক্ষরিক ব্যাখ্যা কিংবা কোন অংশের অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য অযৌক্তিক ব্যাখ্যার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে পবিত্র কোরআনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলীর প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা হতে উদ্ভূত তথাকথিত হিল্লাহ্ বিবাহ অর্থাৎ তালাকের পর অন্য স্বামী গ্রহণ ও তার সাথে বিচ্ছেদের পর পূর্বের স্বামীর সাথে পুণরায় বিবাহ করা, তার প্রমাণ। হিল্লাহ্ বিবাহের পরিণামসমূহ আলোচনা করলে সহজেই প্রতিয়মান হয় ইসলামের মত একটি মহান ধর্ম হিল্লাহ্ বিবাহ অনুমোদন করতে পারে না। এর কতিপয় পরিণাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। মুসলিম আইনে বিবাহ একটি চুক্তি যার প্রধান শর্ত হচ্ছে পুরুষ ও নারীর স্বাধীন সম্মতি প্রকাশ। কিন্তু হিল্লাহ বিবাহে নারীর স্বাধীন সম্মতির প্রকাশ ঘটে না, বলে তা এমনিতেই অবৈধ হয়ে যায়।

২। পরিবারে বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বর্তমানে হিল্লাহ্ বিবাহে বাধ্য করলে সন্তানদের সামনে মায়ের জন্য যে করুণ ও অবমাননাকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা পবিত্র কোরআন যে অনুমোদন করতে পারে না, যারা কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাদের নিকট খুবই স্পষ্ট।

৩। হিল্লাহ্ বিবাহে স্ত্রী যদি গর্ভবতী হন এবং পূর্বের স্বামী তাকে আবার বিবাহ করেন তাহলে হিল্লাহ্ বিবাহের ফলে জন্ম নেয়া শিশুর অবস্থান, মর্যাদা ও করুণ পরিণাম সহজেই অনুমেয়।

৪। যে কোন হিল্লাহ্ বিবাহের অবসানে অনেক সময় পূর্ব স্বামী তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পুণরায় গ্রহণ করতে রাজী হন না, কারণ তার স্ত্রী ইতোমধ্যে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেছেন। তখন ঐ স্ত্রীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

৫। তালাক-ই-বিদা বা তিন তালাকের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক প্রদান স্বামীর সাময়িক উত্তেজনার (spur of the moment) অন্যায় বহিঃপ্রকাশ যার শাস্তি বা বিরূপ ফল ভোগ করে স্ত্রী। ইসলাম ধর্ম পরার্থ দায় (vicarious liability) অনুমোদন করে না। অথচ এ ক্ষেত্রে স্বামীর ভুল বা সাময়িক অসহিষ্ণুতার দায় ভোগ করতে হচ্ছে স্ত্রীকে।

মহানবীর (সাঃ) উপদেশ ও পরামর্শেও হিল্লাহ্ বিবাহের অনুমোদন পাওয়া যায় না। একবার তিন তালাকের মাধ্যমে তালাক চূড়ান্ত করার ঘটনা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং তিন মাস অপেক্ষার শাস্তি ভোগ করে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারাহ্ ২২৪ থেকে ২৩২ আয়াত একসঙ্গে বা পারম্পরিক যোগসূত্রের ধারায় পড়লে হঠাৎ করে সাময়িক উত্তেজনায় তালাক-ই-বিদার পর প্রিয়তমা স্ত্রীকে আবার ফিরে পাবার জন্য অন্য পুরুষের সাথে বিবাহের পর তাকে পুণরায় বিবাহের অসারতা সহজেই ধরা পড়ে। আয়াতসমূহ হতে প্রতিয়মান হয় যে, ইদ্দত কাল বা তিন মাসের মধ্যে আপস-নিষ্পত্তির মাধ্যমে স্ত্রীর সঙ্গে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা নেই।

হিল্লাহ্ বিবাহের পক্ষে রক্ষণশীলদের মূল যুক্তি হচ্ছে আয়াত ২৩০ যেখানে বলা হয়েছে "তারপর ঐ স্ত্রীকে যদি সে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (২য় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের মিলনে কারও কোন দোষ নেই,.....।" এখানে বলা হয়েছে তালাকের পরে স্ত্রীর আরেকটি বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে বৈধ হবে না। অবশ্যই তালাক অবস্থায় কেন বৈধ হবে? তবে পুণরায় বিবাহ করে বৈধতা সৃষ্টিতে বাঁধা কোথায়? হ্যাঁ হিল্লাহ্ বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও বৈধতা আসবে, যা পুণরায় বিবাহের মাধ্যমে সিদ্ধ করা হয়। কিন্তু হিল্লাহ্ বিবাহের পূর্বেই পুণরায় বিবাহের মাধ্যমে বৈধতা সৃষ্টিতে কোন সুস্পষ্ট বাধা-নিষেধ কোরআনে নেই।

শুধু তালাক-ই-বিদা বা তিন তালাকের অন্যায়ের শাস্তি হিসেবে কোরআন স্বামীকে স্ত্রীর কাছ থেকে তিন মাস বিরত থাকা এবং পুণরায় বিবাহের শর্তযুক্ত করেছে। পবিত্র কোরআনের এটাই হবে যৌক্তিক ব্যাখ্যা। এটি হিল্লাহ বিবাহের উল্লিখিত পরিণাম পাঠে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

সুপারিশসমূহ

১। সন্তানের স্বার্থের সংজ্ঞা নির্ধারণ ও তা রক্ষার শর্তাবলী ও নীতিমালা ব্যাখ্যা করে অভিভাবকত্ব এবং হেফাজতের ক্ষেত্রে সন্তানের স্বার্থই সর্বোচ্চ বিবেচনায় নেয়ার বিধান করে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করা উচিত।

২। বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ইদ্দতকালীন সময়ের পরও ক্ষেত্র বিশেষে স্ত্রীর পুনঃবিবাহ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবেন যদি স্ত্রী নিজের ভরণপোষণে অক্ষম হন, অথবা এককালীন ক্ষতিপূরণ হিসেবে স্ত্রীকে 'মাতা' দিতে হবে। অন্যদিকে, স্বামী যদি উপার্জনক্ষম না হন বা অসুস্থ হন তবে তারাও আর্থিকভাবে সক্ষম স্ত্রীদের কাছ থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন।

৩। দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিধানকে ব্যক্তির ইচ্ছা বিরোধী, যা অমানবিক, এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবিধানের পরিপন্থী ঘোষণা করে ফ্যামিলি কোর্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর এখতিয়ার থেকে বাদ দেয়া উচিত।

৪। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে আরবিট্রেশন কাউন্সিলকে তার ইচ্ছা মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার না দিয়ে বরং সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা যায়। কেবলমাত্র সেসব শর্তের ভিত্তিতে আরবিট্রেশন কাউন্সিল দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করবে। আরবিট্রেশন কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আর কাউন্সিল যদি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে তাহলে তার দায়বদ্ধতা থাকবে।

৫। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ৮ এর মাধ্যমে তালাকের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনা হয়েছে। আর তালাক-ই-তাওফিজের বিষয়টি মেয়েদের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলে তালাকের ক্ষেত্রেও সমতা আনা সম্ভব।

৬। দত্তক সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। দত্তকগ্রহণকারী পিতামাতাই সন্তানের অভিভাবক এবং দত্তকি পিতামাতা হিসেবে পরিচয় প্রদান করতে পারবেন। দত্তক সন্তানদের কিভাবে তাদের পিতামাতার সম্পত্তিতে অধিকার দেয়া যায় তা অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো হতে পারে অথবা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যেতে পারে।

৭। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ দ্বারা হিল্লাহ্ বিবাহ কার্যত বাতিল হলেও অবৈধ ফতোয়ার প্ররোচনায় তালাক-ই-বিদা বা তিন তালাকের পরে পুণরায় বিবাহের জন্য গ্রামাঞ্চলে কোন কোন সময় এখনো হিল্লাহ্ বিবাহের ঘটনা ঘটে, যা বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

৮। ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের প্রতিনিধিত্ব তত্ত্বের অধীন পূর্বে মৃত পিতা-মাতার মাধ্যমে নাতির অবর্তমানে নাতনী কর্তৃক পিতামহের উত্তরাধিকারী মৃত পিতা-মাতার পুরো অংশ পাওয়া এবং শিয়া মতবাদের সাথে সাদৃশ্যের আলোকে পুত্রের অবর্তমানে কন্যার উত্তরাধিকার সম্পত্তি বৃদ্ধির বিধান করা উচিৎ। এ বিষয়ে আইন কমিশনের ১১৩ নং রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লিখিত সুপারিশসমূহ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিষয় ভিত্তিক আলাদা আইন অথবা একত্রে **'মুসলিম পারিবারিক আইন সংহিতা'** নামে আইনে রূপ দেয়া যেতে পারে।

(অধ্যাপক ড. এম. শাহ আলম)
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন।